শিশু-সাহিত্য

যে-কোনো ভাষাতেই হোক না কেন, সমাস-ব্যবহারের ভিতর যে বিপদ আছে, সেবিষয়ে শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র ঘটক আমাদের সতর্ক করে দিয়েছেন। আমরা যদি কথার গায়ে কথা জড়িয়ে লিখি, তা হলে পাঠকদের পক্ষে তা ছাড়িয়ে নিয়ে পড়া কঠিন : ত্বষ্টা পুত্র বৃত্রকে আশীর্বাদ করেছিলেন 'ইন্দ্রশত্রু হও'। কিন্তু সমাসের কৃপায় সে বর যে কি মারাত্মক শাপে পরিণত হয়েছিল, তার আমূল বিবরণ 'শতপথ ব্রাহ্মণে' দেখতে পাবেন। সুতরাং পাঠক যাতে উলটো না বোঝেন, সে কারণ এ প্রবন্ধের সমস্ত-নামটির অর্থ প্রথমেই বলে রাখা আবশ্যক। এ প্রবন্ধে ব্যবহৃত শিশু-সাহিত্যের অর্থ বঙ্গসাহিত্য নয়। শিশুদের জন্য বাংলাভাষায় যে সাহিত্যেব আজকাল নিত্যনব সৃষ্টি করা হচ্ছে সেই সাহিত্যই আমার বিচার্য।

শিশু-সাহিত্য বলে কোনো জিনিস আছে কি না, যা বিশেষ করে শিশুদের জন্যই লেখা হয় তাকে সাহিত্য বলা চলে কি না, এবিষয়ে অনেকের মনে বিশেষ সন্দেহ আছে ; আমার মনে কিন্তু নেই। আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, শিশু-সাহিত্য বলে কোনো পদার্থের অস্তিত্ব নেই এবং থাকতে পারে না। কেননা, শিশু-পছন্দ সাহিত্য শিশু ব্যতীত অপর-কেউ রচনা করতে পারে না, আর শিশুরা সমাজের উপর আর যে অত্যাচারই করুক-না কেন, সাহিত্যরচনা করে না।

বিলেতে চিল্‌ড্রেনের সাহিত্য থাকতে পারে, এদেশে নেই ; কেননা, সেদেশের চাইল্ডের সঙ্গে এদেশের শিশুর ঢের তফাত— বয়েসে। এদেশে আর-কিছু বাড়ুক আর না-বাড়ুক, বয়েস বাড়ে ; আর সে এত তেড়ে যে, আমাদের ছেলেমেয়েরা যত সত্বর শৈশব অতিক্রম করে, পৃথিবীর অপর-কোনো দেশে তত শীঘ্র করে না। অন্তত এই হচ্ছে আমাদের ধারণা। ফলে, যে বয়েসে ইউরোপের মেয়েরা ছেলেখেলা করে, সেই বয়েসে আমাদের মেয়েরা ছেলে মানুষ করে। এবং সেই ছেলে যাতে শীঘ্র মানুষ হয়, সেই উদ্দেশ্যে আমরা শৈশবের মেয়াদ পাঁচ বৎসরের বেশি দিই নে। আজকাল আবার দেখতে পাই, অনেকে তার মধ্যেও দু বছর কেটে নেবার পক্ষপাতী। শৈশবটা হচ্ছে মানবজীবনের পতিত জমি ; এবং আমাদের বিশ্বাস, সেই পতিত জমি যত শীঘ্র আবাদ করা যাবে, তাতে তত বেশি সোনা ফলবে।

বাপ-মা'র এই সুবর্ণের লোভবশত এদেশের ছেলেদের বর্ণপরিচয়টা অতি শৈশবেই হয়ে থাকে। একালের শিক্ষিত লোকেরা ছেলে হাঁটতে শিখলেই তাকে পড়তে বসান। শিশুদের উপর এরূপ অত্যাচার করাটা যে ভবিষ্যৎ বাঙালিজাতির পক্ষে

কল্যাণকর নয়, সেবিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই ; কেননা, যে শৈশবে শিশু ছিল না, সে যৌবনে যুবক হতে পারবে না। আর একথা বলা বাহুল্য, শিশুশিক্ষার উদ্দেশ্যই হচ্ছে শিশুর শিশুত্ব নষ্ট করা ; অর্থাৎ যার আনন্দ উপভোগ করবার শক্তি অপরিমিত, তাকে জ্ঞানের ভোগ ভোগানো। সে ভোগ যে কি কর্মভোগ, তা চেষ্টা করলে আমরাও কল্পনা করতে পারি। ধরুন, যদি আমরা স্বর্গে যাবামাত্র স্বর্গীয় মাস্টারমহাশয়দের দল এসে আমাদের স্বর্গরাজ্যের হিস্টরি-জিয়োগ্রাফি শেখাতে এবং দেবভাষার শিশুবোধ-ব্যাকরণ মুখস্থ করাতে বসান, তা হলে আমাদের মধ্যে ক'জন নির্বাণ-মুক্তির জন্য লালায়িত না হবেন ? আর একথাও সত্য যে, শিশুর কাছে এ পৃথিবী স্বর্গ। তার কাছে সবই আশ্চর্য, সবই চমৎকার, সবই আনন্দময়।

এসব কথা অবশ্য বলা বৃথা ; কেননা, আমরা শিশুকে শিক্ষা দেবই দেব। মেয়েরা কথায় বলে, 'পড়লে-শুনলে দুধু-ভাতু, না পড়লে ঠেঙার গুঁতো' ; কথাটা অবশ্য ষোলো-আনা সত্য নয়। সংসারে প্রায়ই দেখা যায়, সরস্বতীর বরপুত্রেরাই লক্ষ্মীর ত্যাজ্যপুত্র। আমাদের কিন্তু মেয়েলি-শাস্ত্রে ভক্তি এত অগাধ যে, আমরা ছেলেদের ভবিষ্যতের দুধু-ভাতুর ব্যবস্থা করবার জন্য বর্তমানে দু বেলা ঠেঙার গুঁতোর ব্যবস্থা করি। ছেলেদের দেহমনের উপর মারপিট বছর-সাতেকের জন্য মুলতবি রাখলে যে কিছু ক্ষতি হয়, অবশ্য তা নয়। যে ছেলে সাত বৎসর বয়েসে 'সিদ্ধিরস্তু' লিখবে, তিন-সাত্তা-একুশ বৎসর বয়েসে তার মনস্কামনা নিশ্চয়ই সিদ্ধ হবে ; অর্থাৎ সে সাবালক হবার সঙ্গে-সঙ্গেই উপাধিগ্রস্ত হয়ে বিশ্ববিদ্যালয় হতে নিষ্কৃতিলাভ করবে। তবে যদি কারও চৌদ্দ বৎসরেও স্কুলবাস অন্ত না হয়, তা হলে বুঝতে হবে ভগবান তার কপালে উপবাস লিখেছেন। তাকে যতদিন ধরে যতই লেখাও, সে ঐ এক কপালের লেখাই লিখবে।

শিশুশিক্ষা-জিনিসটে আমরা কেউ বন্ধ করতে পারব না, কিন্তু তাই বলে কি আমাদের ও-ব্যাপারের যোগাড় দেওয়া উচিত। সাহিত্যের কাজ তো আর সমাজকে এলেম দেওয়া নয়, আক্কেল দেওয়া। সুতরাং আমরা যদি পাঁচ বছর বয়েসের ছেলের যোগ্য এবং উপভোগ্য সাহিত্য লিখতেও পারি, তা হলেও আশা করি কোনো পাঁচ-বছরের ছেলে তা পড়তে পারবে না। আর ও-বয়েসের কোনো ছেলে যদি পঠন-পাঠনে অভ্যস্ত হয়, তা হলে তার হাতে শিশু-সাহিত্য নয়, বেদান্ত দেওয়া কর্তব্য। কেননা, সে যত শীঘ্র 'বালাযোগী' হয়, তত তার এবং সমাজের উভয়েরই পক্ষে মঙ্গল। প্রথমত, ওরকম ছেলের বাঁচা কঠিন, আর যদি সে বাঁচে তা হলে সমাজের বাঁচা কঠিন ; কেননা, অমন সুপুত্র বাঁচলে— হয় একটি বিগ্রহ, নয় গ্রহ হতে বাধ্য। অকালপক্কতার

প্রশ্রয় দেওয়াটা একেবারেই অন্যায়; কেননা কাঁচা একদিন পাকতে পারে, কিন্তু অকালপক্ক আর ইহজীবনে কাঁচতে পারে না। ইতিহাসে এর প্রমাণ আছে। শিক্ষাবাতিকগ্রস্ত বাপের তাড়নায় বারো বৎসর বয়েসে সর্বশাস্ত্রে পারগামী হওয়ার দরুন জন্‌স্টুয়ার্ট মিল্‌এর হৃদয়-মন যে কতদূর ইঁচড়ে পেকে গিয়েছিল, তার পরিচয় তিনি নিজমুখেই দিয়েছেন। ফলে, তিনি বৃদ্ধবয়সে কাঁচতে গিয়ে বিবাহ করেন।

অতএব দাঁড়াল এই যে, শিশু-সাহিত্য বলে কোনো জিনিস নেই এবং থাকা উচিত নয়। তবে শিশুপাঠ্য না হোক, বালপাঠ্য সাহিত্য আছে এবং থাকা উচিত। এ সাহিত্য সৃষ্টি করবার সংকল্প অতি সাধু। কেননা, শিশুশিক্ষার পুস্তকে যে বস্তু বাদ পড়ে যায়— অর্থাৎ আনন্দ— সেই বস্তু যুগিয়ে দেবার উদ্দেশ্যেই এ সাহিত্যের সৃষ্টি। পৃথিবীতে অবশ্য সাধুসংকল্পমাত্রেই আমরা কার্যে পরিণত করতে পারি নে। সুতরাং এস্থলে জিজ্ঞাস্য— আমরা পণ করে বসলেই কি সে সাহিত্য রচনা করতে পারব? আমি বলি, না। এর প্রমাণ, ছেলেরা যে সাহিত্য পড়ে আর পড়তে ভালোবাসে, তা মুখ্যত কি গৌণত ছেলেদের জন্য নয়, বড়দের জন্যই লেখা হয়েছিল। রূপকথা রামায়ণ মহাভারত আরব্য-উপন্যাস ডন-কুইক্‌সোট গ্যালিভারস্‌-ট্রাভেল্‌স্‌ রবিনসন-ক্রুসো— এসবের কোনটিই আদিতে শিশুদের জন্য রচিত হয় নি। এর থেকেই প্রমাণ হয় যে, উচ্চ-অঙ্গের সাহিত্যেরই একটি বিশেষ অঙ্গ ছেলেরা আত্মসাৎ করে নেয়।

আসলে, ছেলেরা ভালোবাসে শুধু রূপকথা— স্বরূপ কথাও নয়, অরূপ কথাও নয়; অর্থাৎ জ্ঞানের কথাও নয়, নীতির কথাও নয়। উপরে যেসব বইয়ের নাম করা গেল, তার প্রতিটিতেই রূপকথার রূপ আছে। আমরা যে শিশুসাহিত্য রচনা করতে পারি নে, তার কারণ আমরা চেষ্টা করলেও রূপকথা তৈরি করতে পারি নে। যে যুগে রূপকথার সৃষ্টি হয়, সে যুগ হচ্ছে মানবসভ্যতার শৈশব। সেকালে লোক মনে শিশু ছিল, সে যুগে সম্ভব-অসম্ভবের ভেদজ্ঞান মানুষের মনে তেমন স্পষ্ট হয়ে ওঠে নি। একালের আমরা মনে জানি সবই অসম্ভব, আর ছেলেরা মনে করে সবই সম্ভব। তাছাড়া, আমাদের কাছে পৃথিবীর সব জিনিসই আবশ্যক, কোনো জিনিসই চমৎকার নয়; আর ছেলেদের কাছে সব জিনিসই চমৎকার, কোনো জিনিসই আবশ্যক নয়। সুতরাং আমাদের পক্ষে তাদের মনোমত সাহিত্য রচনা করা অসম্ভব। আমরা রূপকথা লিখতে বসলে, হয় তা কিছুই হবে না, নয় রূপক হবে; কেননা, রূপকথার জন্ম সত্যযুগে, আর রূপকের জন্ম সভ্যযুগে।

এই রূপকের মধ্যেই হাজারে একখানা ছেলেদের কাছে নবরূপকথা হয়ে দাঁড়ায়, যথা ডন-কুইক্‌সোট গালিভার'স্‌-ট্রাভেল্‌স্‌ ইত্যাদি। বলা বাহুল্য, এ জাতের রূপকথা